ঃ পত্রিকা যোগাযোগ ঃ
রাজা রাউত (জলপাইগুড়ি)-৯৪৭৪৪১৭১৭৮
তুহিন শুভ্র মন্ডল (বালুরঘাট)-৯৪৭৫৯৩১২৯০
অভিজিৎ অধিকারী (চাকদহ)-৯৭৪৯৪৮৬৬৪৯
ময়ূখ ব্যানার্জী (কোচবিহার)-৯৪৭৪৮৩১০৮৬
সৌম্যকান্তি জানা (কাকদ্বীপ)-৯৪৩৪৫৭০১৩০
সুরজিৎ দাস (কাঁচরাপাড়া)-৯৪৩২৬৮৬৫১০
পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় (ত্রিবেণী)-৯৪৭৭০৬৪৭০৪

বিজ্ঞান অন্বেষক

ঃ পত্রিকা যোগাযোগ ঃ
অমিত কুমার নন্দী (চুঁচুড়া)-৯৪৩৩৯০৬৬২৩
বিবর্তন ভট্টাচার্য্য (নদীয়া)-৯৪৩৪১১০৯৬৯
গ্রাহক মূল্য : বার্ষিক ১০ টাকা, যোগাযোগ ঃ বিজ্ঞান অন্বেষক, প্রযত্নে : বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড,(বিনোদনগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া-৭৪৩১৪৫ উত্তর ২৪ পরগণা।

বর্ষ-৮ সংখ্যা - ২ মার্চ/এপ্রিল /২০১১ RNI No. WBBEN/03/11192 মূল্য : ১

উত্তরবঙ্গের অরণ্য সম্পদ

উত্তরবঙ্গ বলতে বাংলার প্রধান নদী গঙ্গার উত্তরের অংশকে বোঝায়। এই উত্তরবঙ্গ ছটি জেলার সমষ্টি (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা) যার মধ্যে একদিকে যেমন পাহাড়ের ছোঁয়া আছে তেমনি আছে বিস্তীর্ণ সমভূমি অঞ্চল। এদের বুক চিরে গেছে তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা, রায়ডাক, কালজানি, মুজনাই, সংকোশ, মহানন্দা প্রভৃতি বড় নদী। এছাড়া রয়েছে অংসখ্য ছোট ছোট নদী (যেমন-নেওড়া, চেল, লিস্, ঘিস্, আত্রেয়ী, কুলীক, করতোয়া প্রভৃতি) এবং ঝোড়ার সমষ্টি যার মাঝেই দাঁড়িয়ে আছে উত্তরবঙ্গের অরণ্য সম্পদ। উত্তরবঙ্গের অরণ্য সম্পদ প্রধানত দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বর্তমানে সারা উত্তরবঙ্গে আনুমানিক মোট ৩১০৬ বর্গ কি.মি. বনভূমি আছে, যার অধিকাংশ (প্রায় ৩০৭৪ বর্গ কি.মি.) দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের অধীনে।

বিশ্বের বর্তমান ২৫টি মেগাডাইভারসিটি অঞ্চলের ২টি রয়েছে ভারতে। যার একটির কিছু অংশ রয়েছে এই উত্তরবঙ্গের সুদূর উত্তর পূর্ব অংশে। জৈব বৈচিত্র্যে ভরপুর এই উত্তরবঙ্গ।

এরপর 2 পাতায়

গঙ্গা নদী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

গঙ্গা যখন ধোবীঘাট

পবিত্রতা ও শুদ্ধতার ধারণার পাশাপাশি গঙ্গা নিত্য বহমান ও তার জলরাশি অফুরন্ত—এই ধারণাও অতি প্রাচীন। কিন্তু বিশ্ব উষ্ণায়ণ বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর প্রভাবে আবহাওয়ার অদ্ভুত পরিবর্তন এখন ওই ধারণাতেও ফাটল ধরাতে চলেছে। পরিবেশবিদ এবং বিজ্ঞানীদের একাংশের ভবিষ্যদ্বাণী আগামী ৩০ বছরের মধ্যে গঙ্গা জলশূন্য হয়ে যাবে। যেহেতু উষ্ণায়নের ফলে গঙ্গার উৎসস্থল গঙ্গোত্রী-সহ হিমবাহগুলি গলতে শুরু করেছে। হিমবাহগুলি না থাকলে সেগুলি থেকে সৃষ্ট সব নদীর অস্তিত্বও অচিরে লোপ পাবে। নদীর অস্তিত্বের সঙ্কট তৈরি হলে নদীমাতৃক সভ্যতাগুলিও বিপন্ন হয়ে পড়বে। হৃষীকেশ থেকে কলকাতা—গঙ্গার প্রবাহ যদি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসে, তা হলে এর দু'পাশের জনবসতি সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। গঙ্গা

এরপর 7 পাতায়

বিশুদ্ধ পানীয় জলের দাবী মেটাতে জল প্রকল্প চাকদহে

চাকদহের পানীয় জলে আর্সেনিক আছে তা বিভিন্ন পরীক্ষাগারের রিপোর্টের মধ্য দিয়ে ১৯৯৯ সাল থেকে বলে চলেছেন চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার কর্মীরা। এর মধ্যে হরিণঘাটা ও চাকদহ ব্লকে শুধু আর্সেনিকযুক্ত পানীয় জল খেয়ে মারা গেছেন প্রায় ১০০-রও বেশি মানুষ। তাতেও টনক নড়েনি বধির প্রশাসকগণের। আমাদের প্রিয় বন্ধু ও আর্সেনিক মুক্ত জলের আন্দোলনের শরিক সামিরুল মন্ডল মারা গেছেন। আর্সেনিকোসিসে। ১০নং ওয়ার্ড (চাকদহ পৌরসভা)-এর ঠাকুরকলোনির বাসিন্দা কানাই কর্মকার মৃত্যুমুখে। স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন ওকে জবাব দিয়ে দিয়েছে। বর্তমান এম.পি., প্রাক্তন এম.পি., রাজ্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী এমনকি এস. আই.পি.আর.ডি.-র অধিকর্তা শক্তিকুমার চট্টোপাধ্যায় তৎকালীন ইউনিসেফ অধিকর্তা চন্দন সেনগুপ্তকে বিষয়টি

এরপর 8 পাতায়

অরণ্য সম্পদ....

1 পাতার পর

উত্তরবঙ্গের অরণ্য এলাকায় মোটামুটি ৫-৬টি প্রধান বাস্তুতন্ত্র পাওয়া যায় যথা উচ্চ পার্বত্য এলাকায় ওক্, রডোডেনড্রন, জুনিপার, হেমলকের দুর্ভেদ্য অরণ্য, মধ্য পার্বত্য এলাকায় উপক্রান্তীয়; আদ্রপর্ণমোচী সহ নাতিশীতোষ্ণ অরণ্য; নিম্নপার্বত্য এলাকা ও পাদদেশে মিশ্রশাল জঙ্গল এবং নদীচরে বা প্লাবনভূমিতে খয়ের শিরিষ শিমুলের জঙ্গল উল্লেখযোগ্য। সমতলের প্রায় ৩৫ ভাগ এবং পাহাড়ী অঞ্চলের প্রায় ৭০ ভাগ জঙ্গল এখন রোপিত (Planted) অরণ্য যার অধিকাংশ তৈরি হয়েছে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৮৯ এর মধ্যে।

ভৌগলিক অঞ্চল অনুযায়ী রোপিত ও প্রাকৃতিক অরণ্যকে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা যায় যথা—তরাই (মেচি ও তিস্তা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল); পশ্চিমডুয়ার্স (তিস্তা ও তোর্ষা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল); পূর্বডুয়ার্স (তোর্ষা ও সংকোশ নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল) এবং পার্বত্য অঞ্চল (কার্শিয়াং, কালিম্পং ও দার্জিলিং এর পাহাড়ী অঞ্চল)।

উত্তরবঙ্গের প্রধান বনাঞ্চল

উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলকে প্রধান ৬টি ভাগে ভাগ করা যায় যথা—

১) **সমতল শাল অরণ্য** ঃ— তরাই এর লালটং, শালুগাড়া, বাগডোগরা, শুকনা; পশ্চিম ডুয়ার্সের-মোরাঘাট, টুন্ডু, আপালচাঁদ; পূর্বডুয়ার্সের—চিলাপাতা, রাজাভাত খাওয়া, দমনপুর প্রভৃতি অঞ্চল এর মধ্যে পরে যা যথাক্রমে কার্শিয়াং বন্যপ্রাণী-১, বৈকুণ্ঠপুর, জলপাইগুড়ি বন্য প্রাণী-২, কোচবিহার এবং বক্সা ব্যাঘ্রবন বনবিভাগের অন্তর্গত।

২) **খয়ের-শিশু বা চর বনাঞ্চল** (Riverine Forest) ঃ— তরাই এর সেভক; পশ্চিমডুয়ার্সের-ডায়না, মূর্তি, জলদাপাড়া; পূর্ব ডুয়ার্সের-পানা, রায়ডাক, জয়ন্তী প্রভৃতি অঞ্চল এর মধ্যে পড়ে যা জলপাইগুড়ি বন্যপ্রাণী-১, কোচবিহার ও বক্সা বিভাগের অন্তর্গত।

৩) **ভেজা মিশ্র শাল এবং আর্দ্র পর্ণমোচী অরণ্য** (Wet Mixed Sal & Moist Deciduous forests) ঃ— তরাই এর - শুকনা, সেভক, বাগডোগরা; পশ্চিম ডুয়ার্সের—আপালচাঁদ, মোরাঘাট, গরুমারা, চাপড়ামারি; পূর্ব ডুয়ার্সের—চিলাপাতা, রাজাভাত খাওয়া, জয়ন্তী, বক্সা, নিমতি প্রভৃতি অঞ্চল পড়ে যা কার্শিয়াং, জলপাইগুড়ি বন্যপ্রাণী বিভাগ—১৩২, কোচবিহার ও বক্সা বিভাগের অধীনে।

৪) **মধ্য ও নিম্ন পার্বত্য অরণ্য** (Sub Himalayan Forest) তরাই এর—কালিঝোরা-লাট পাঞ্চার, পানিঘাটা; পশ্চিমডুয়ার্সের-চেল, নোয়াম, জলঢাকা, সামানিং, নেওড়াভ্যালী, পূর্ব ডুয়ার্সের রায়মাটাং, বক্সা, ভুটানঘাট প্রভৃতি অঞ্চল এর মধ্যে পড়ে যা কার্শিয়াং বন্যপ্রাণী-১, কালিম্পং, বক্সা ও জলপাইগুড়ি বন্যপ্রাণী-২ বনবিভাগের অধীনে।

৫) **ভেজা পার্বত্য অরণ্য-নাতিশীতোষ্ণ** (Wet Temperate mountain Forest) ঃ— পার্বত্য অঞ্চলে—সিংগালীলা জাতীয় উদ্যান (সান্দাকফু এলাকা), নেওড়াভ্যালী জাতীয় উদ্যান (আলুবাড়ি, রেনক এলাকা), লাভা, রিম্বিক, সেঞ্চল প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে গঠিত যা কালিম্পং বন্যপ্রাণী-১ ও ২ এবং দার্জিলিং বনবিভাগের আওতায়।

৬) **রডোডেনড্রন অরণ্য** ঃ— পার্বত্য অঞ্চলের সিংগালীলা জাতীয় উদ্যান নেওড়াভ্যালী জাতীয় উদ্যানের জোর পোখ্‌রী, টাংলু, ঘুম প্রভৃতি অঞ্চল এর মধ্যে পড়ে যা দার্জিলিং বন্যপ্রাণী-১ ও ২ বনবিভাগের অধীনে।

তবে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার উত্তরের তিনটি জেলা বাদে বাকি দক্ষিণের তিনটি জেলার ভূ-প্রকৃতি গাঙ্গেয় সমভূমি।

কৃতজ্ঞতা ঃ বিপন্ন পরিবেশ; নাগরিক মঞ্চ, ২০০০

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বন্য প্রাণী অভয়ারণ্য ও জাতীয় উদ্যান

স্বাধীন ভারতে ১৯৮০ সালের পর উত্তরবঙ্গের ৫০ শতাংশ বনভূমিকে বন্যপ্রাণী সংরক্ষিত এলাকা (Protected Area) হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে উত্তরবঙ্গে ৩টি জাতীয় উদ্যান ১টি ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকা (Tiger Project) এবং ৬টি বন্য প্রাণী অভয়ারণ্য রয়েছে যা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

রায়গঞ্জ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

উত্তরদিনাজপুর জেলার সদর শহর রায়গঞ্জ প্রথমে একটি পাখিরালয় হিসেবেই পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে এটিকে অভয়ারণ্য হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয় ১৯৮৫ সালে। এই অভয়ারণ্যের বর্তমান ব্যাপ্তি ১.৩ বর্গ কি.মি.। এই অভয়ারণ্য পরিযায়ী পাখি জন্য বিখ্যাত। এটিকে কুলিক পক্ষী নিবাস নামেও অভিহিত করা হয়।

বনাঞ্চলটি ১৯৬০ সালে বনসৃজনের মধ্য দিয়ে পুনরায় তৈরি করা হয়। এখানে কদম, জারুল, শিশু, সেগুন, খয়ের গাছ বেশি করে দেখা যায়। জায়গাটি অনেকটা উঁচু জায়গার উপর যার নীচের দিকে ঘন উলু ও কাশবন রয়েছে।

অভয়ারণ্য সৃষ্টির ফলে স্থানীয় কিছু প্রাণী যথা, শেয়াল, খেঁকশেয়াল, খরগোশ, বনবিড়াল প্রভৃতি আশ্রয় পেয়েছে। এখানে বিভিন্ন রকমের মাছ ও কাঁকড়া পাওয়া যায়—সেকারণে জায়গাটি পাখিদের আদর্শস্থান। কুলিক নদী ও তৎসলগ্ন জলাভূমি পাখিদের আকর্ষণের মূল জায়গা। জুনমাস নাগাদ প্রতি বছর এই অভয়ারণ্যটিতে বিভিন্ন প্রকার পরিযায়ী পাখিদের মেলা বসে। স্থানীয় পরিযায়ীরাও এখানে ভিড় জমায়। এরা সাধারণভাবে পুঁটি, গুগলি, জলজ বিভিন্ন পোকামাকড়, ব্যাঙ, কেঁচো প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে জলাভূমিটি লতা-গুল্মে, গাছ-গাছড়ায় ঢাকা পড়ে যাওয়ায় পশুপাখিদের কাছে আদর্শস্থান। এখানে সাইবেরিয়া সমেত উত্তরের কিছু পরিযায়ী পাখি ছাড়াও শামুকখোল, বক, পানকৌড়ি, বাজকা, সারস প্রভৃতি পাখিদের দেখা যায়। এরা এখানে বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে, বাচ্চা বড়

এরপর 3 পাতায়

অরণ্য সম্পদ.... 2 পাতার পর

করে এবং বর্ষা শেষে চলে যায়। স্থানীয় পাখিদের মধ্যে ঘুঘু, চিল, পেঁচা, মাছরাঙা, কাঠঠোক্‌রা, ফিঙে প্রভৃতি দেখা যায়।

এই অভয়ারণ্যটি তত্ত্বাবধান করেন বিভাগীয় বনাধিকারিক, পশ্চিমদিনাজপুর বিভাগ। শিলিগুড়ি থেকে জাতীয় সড়ক ধরে চোপড়া-কিশনগঞ্জ-ডালখোলা পেরিয়ে এসে কুলিক নামক একটি ছোট নদীর ধারেই এই অভয়ারণ্যটি সংলগ্ন বনবিভাগের নিয়ন্ত্রানাধীন।

মহানন্দা বন্য প্রাণী অভয়ারণ্য

১৯৪৯ সালে প্রথম সরকারী ভাবে মহানন্দা বন্যপ্রাণী সংরক্ষিত বনকে 'অভয়ারণ্যের' মর্যাদা দেওয়া হয়। সেই সময় বনাঞ্চলটিকে মোট আয়তন ছিল ১২৭ বর্গ কি.মি.। বর্তমানে প্রায় ২১০ বর্গ কি.মি. জায়গা জুড়ে এক ব্যাপ্তি। ভারতীয় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, ১৯৭২ অনুযায়ী এটিকে পুনরায় ১৯৭৬ সালে পুনর্ঘোষিত করা হয় 'অভয়ারণ্য' হিসেবে। 'তিস্তা' ও 'মহানন্দা' এই দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অভয়ারণ্যটি অবস্থিত। এই অভয়ারণ্যটির অভ্যন্তরে একটি কৃত্রিম জলাধার আছে। এই অঞ্চলের শতকরা ৬০ ভাগই প্রায় পার্বত্যভূমি ও বাকি অংশ সমতল। হিমালয়ের ১৫০ মিটার থেকে ১৩০০ মিটার উচ্চতাযুক্ত পাহাড়ী ঢালে অবস্থিত এই অভয়ারণ্যটির প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য অপরূপ।

এই অভয়ারণ্যটি বন ও বন্য প্রাণীর প্রাচুর্য্যে ও বৈচিত্র্যে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। শাল, খয়ের, শিল্ড, শিমুল, শিরিষ, লালি, চিলৌনি, চিকরাশি, উদানি, পিটালি, বহেরা, আমন, টুন, চাঁপ, মিঠা প্রভৃতির সারি সারি গাছ অভয়ারণ্যটিকে অন্যমাত্রা যোগ করে। পাহাড়ী এই অভয়ারণ্যের নীচের দিকে প্রায় ৪০০ মিটার উচ্চতাযুক্ত জমিতে শাল গাছ পাওয়া যায়। এখানকার সমতল অঞ্চলে, শাল, সেগুন, চাঁপ, জারুন, শিল্ড, গামারী, চিক্‌রাশী প্রভৃতি বৃক্ষজাতীয় গাছের দেখা মেলে। ৮০০ মিটারের উপর দিকটা আঙ্গারে, উটিশ, যান ও এপিফাইট জাতীয় উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদের দেখা মেলে।

প্রাণীদের মধ্যে মেরু (পাহাড়ী ছাগল জাতীয় প্রাণী), হিমালয়ের কালো ভালুক, গাউর বা ভারতীয় বাইসন, চিতাবাঘ, বুনোশুয়োর, সম্বর হরিণ, কাকর হরিণ, চিতল হরিণ, অসমীয়া বানর, সজারু, গোসাপ, গিবন জাতীয় বানর, হাতি এবং ডোরাকাটা বাঘ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পাখির বৈচিত্র্যেও এই অভয়ারণ্যটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখলকরে আছে। বর্ষা ও শীতের বহু পরিযায়ী পাখির আনাগোনা হয় এখানে। ছাইরঙের ভারতীয় কোশরাজ বড় ভারতীয় ধনেশ, ভীমরাজ মদনা, ফুলটুলি, লাল মাথা বাঁশপাতি, কালো বুলবুল, মেরুন রঙের ওরিওল, গোল্ডেন ওরিওল, মালকোহা প্রভৃতি পাখি এখানকার উল্লেখযোগ্য।

কাছাকাছি বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে মাত্র ২২ কি.মি দুরত্বে রয়েছে এই অভয়ারণ্যটির প্রবেশ পথ। অভয়ারণ্যটির মাঝখান দিয়ে ৩১ নং জাতীয় সড়ক অভয়ারণ্যটির বুক চিরে গেছে—অভয়ারণ্যটিকে দ্বিখন্ডিত করে। অভয়ারণ্যটি মাত্র ৮-১০ কিমি দূরত্বে নিউজলপাইগুড়ি বা এন. জে. পি. (N.J.P.) রেল স্টেশন অভয়ারণ্যটির পশ্চিম সীমানা ধরে দার্জিলিং ও পূর্ব সীমানা ধরে কালিম্পং শহর পর্যন্ত দুটি পাহাড়ী এই রাস্তা চলে গেছে। অভয়ারণ্যটির শুকনা নামক স্থানে বনবিভাগের বাংলো রয়েছে। নিকটবর্তী শহর শিলিগুড়িতেও পর্যটন আবাস ও বহু হোটেল রয়েছে।

জোরপোখরি স্যালামান্ডার অভয়ারণ্য

স্যালামান্ডার গিরগিটির মত লেজযুক্ত উভচর। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে প্রাণীটির কিছু প্রজাতি আজও বেঁচে রয়েছে সারা পৃথিবীর মাত্র কয়েকটি অঞ্চলে। সারা এশিয়া মহাদেশে এর একটি মাত্র প্রজাতি। হিমালয়ান নিউট্ (*Tylototriton verucosus*) পাওয়া যায় দার্জিলিং জেলার জোর পোখরি স্যালামান্ডার অভয়ারণ্যে। এখানে 'জোর পোখরি' নামক জোড়া হ্রদে এদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে যা ১৯৮৫ সালের মার্চ মাসের সরকারীভাবে অভয়ারণ্যের মর্যাদা পায়। এই হ্রদটি সমেত পুরো অভয়ারণ্যের মোট আয়তন ৪ হেক্টর যা পশ্চিমবঙ্গের 'সবচেয়ে ক্ষুদ্র অভয়ারণ্য' এর মর্যাদা প্রাপ্ত।

পুরানে কথিত আছে এই জাতীয় প্রাণীটি আগুনে বাস করার ক্ষমতা রাখত। এই উভচরের নরম ও ভিজে চামড়া অগ্নিনিরোধক বলে বিশ্বাস করা হত। ইউরোপে লক্ষ লক্ষ বছর আগেই এই জাতীয় প্রাণীটির বিলুপ্তি ঘটেছে। বিরল প্রজাতির এই প্রাণীটি দার্জিলিং এর পর্বতাঞ্চলে বিচ্ছিন্ন ভাবে পাওয়া যায়। স্থানীয় ভাষায় এদের 'সোরা' নামে ডাকা হয়। এই অভয়ারণ্যটিতে প্রাণীটিকে নিরাপদে ও স্বাধীনভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে যা পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের বিষয়। ভারতের বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আইন, ১৯৭২ অনুযায়ী এরা সংরক্ষিত প্রাণী।

অভয়ারণ্যটির নিকটবর্তী শহর 'সুখিয়াপোখরি' যা সড়কপথে দার্জিলিং ও মিরিকের সাথে যুক্ত। দার্জিলিং শহর থেকে মাত্র ২০ কিমি দূরে অবস্থিত এই অভয়ারণ্যটি পর্যটকদের কাছে সহজলভ্য। 'লেপচাজগৎ'-এ বনবিভাগের বন বাংলোয় রাত্রিকালের ব্যবস্থা আছে। এছাড়া প্রচুর বেসরকারী হোটেল আছে।

সেঞ্চল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

সেঞ্চল প্রাকৃতিক ও রোপিত—এই দু'রকম অরণ্যের সমষ্টি। ১৮৯২ সালে ইংরেজরা প্রথম এই অঞ্চলে বৃক্ষরোপন শুরু করে। দার্জিলিং শহর থেকে মাত্র ১১ কিমি দূরে জোড়বাংলোর কাছেই এই অভয়ারণ্যটি অবস্থিত। বর্তমানে এই অভয়ারণ্যটির মোট আয়তন ৩৮.৬০ বর্গ কিমি। ১৯১৫ সালে প্রথম এটিকে সংরক্ষিত বনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এরপর ১৯৭৬ সালে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য হিসেবে মর্যাদা লাভ করে।

এরপর 6 পাতায়

গঙ্গা নদী সংরক্ষণ

1 পাতার পর

নদীর সংরক্ষণ বা একে রক্ষা করা যে কতটা জরুরি তা গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চলের বিস্তৃতি ও গুরুত্ব থেকে বোঝা যায়।

ভারতের ২৬ শতাংশ ভূমি গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চলের মধ্যে পড়ছে এবং দেশের জনসংখ্যার ৪৩ শতাংশকে বহন করছে এই গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চল। সমগ্র গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চলের আয়তন ১০ লক্ষ বর্গকিলোমিটারের বেশি এবং ভারত ছাড়াও নেপাল ও বাংলাদেশে গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চল বিস্তৃত। তবে গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চলের ৭৯ শতাংশই রয়েছে শুধু ভারতে। এর মধ্যে পড়ছে উত্তরাখন্ড, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, দিল্লি, ছত্তীসগঢ়, ঝাড়খন্ড, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ—এই রাজ্যগুলি। গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চলের জনসংখ্যা ৫০ কোটির বেশি। পৃথিবীর নদী অববাহিকাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চলে।

গঙ্গাকে বাঁচিয়ে রাখতে নদী সংরক্ষণের গোটা কার্যক্রমটাই ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, বিশেষ করে গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানের কথা মাথায় রেখে। নতুন সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমগ্র গাঙ্গেয় জাতীয় নদীর মর্যাদা দিয়েছে এবং জাতীয় গঙ্গা নদী অববাহিকা কর্তৃপক্ষ বা ন্যাশনাল গঙ্গা রিভার বেসিন অথরিটি গঠন করা হয়েছে ২০০৯-এর ২০ ফেব্রুয়ারি। গঙ্গা নদী সংরক্ষণ ও তাকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করার পরিকল্পনা সফলভাবে কার্যকর করা নবগঠিত ওই সংস্থার লক্ষ্য।

গঙ্গায় জীববৈচিত্র

গাঙ্গেয় অববাহিকা বিস্তীর্ণ সমভূমি ভারতের বিপুল জীববৈচিত্র্যকে লালন-পালন করে। মানুষ যার অন্যতম। গঙ্গার উৎস গোমুখের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে বঙ্গোপসাগরে তার মিলনস্থল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অংশ প্রাণী ও উদ্ভিদের বৈচিত্র্য বিভিন্ন রকম। হিমালয় অঞ্চলে যেমন পাইন, দেবদারু, ওক, রডোডেনড্রন, শাল, শিমুল, হলুদ, খয়ের, শিশু, বাঁশ—এই সব গাছের আধিক্য বেশি। আবার গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে আম, কাঁঠাল, জাম, পেয়ারা, মহুয়া, কুলের মতো গাছ এবং ছোটবড় ঘাস বেশি দেখা যায়। তেমনই নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমির বৈশিষ্ট্য চিরহরিৎ বনভূমি, পর্ণমোচী ও কাঁটাঝোপ। এই নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমির সব চেয়ে নীচের অংশ সুন্দরবন—বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য।

গঙ্গার বিস্তীর্ণ প্রবাহে অনন্য প্রাণী বৈচিত্রও লক্ষ্য করার মতো। ছোট ছোট প্লাঙ্কটন বা প্রাণিকণা থেকে শুরু করে নানা রকম পোকামাকড়, শামুক, ঝিনুক, মাছ, উভচর, সরীসৃপ, পাখি এবং স্তন্যপায়ীও এই বিশাল তালিকায় রয়েছে। এখানে ১১টি প্রজাতির স্তন্যপায়ীর মধ্যে তিনটি ভিন্ন প্রজাতির ডলফিন পাওয়া যায়। সরীসৃপের ২৫টি প্রজাতির মধ্যে ঘড়িয়াল, কুমির এবং মোহনার কুমির বিশেষ উল্লেখ্য। ১০১টি প্রজাতির পাখি গঙ্গার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দেখা গিয়েছে। তবে সব চেয়ে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করার মতো মাছেরা। এখনও পর্যন্ত দেখা গিয়েছে, ৩৮২টি প্রজাতির মাছ গঙ্গায় বিচরণ করে। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত দূষণ এবং গঙ্গার প্রবাহ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হওয়ার ফলে এই মাছেদের অনেক প্রজাতিই এখন লুপ্তপ্রায়।

—তথ্যসূত্র ঃ পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ

রিপোর্ট

গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ আয়োজিত আলোচনাচক্রে উপস্থাপিত নিবন্ধ

"বাংলায় প্রকাশিত বিজ্ঞান পত্রিকার মুদ্রণ সংখ্যা কম কেন?"

বাংলা ভাষায় নিয়মিত প্রকাশিত বিজ্ঞান পত্রিকার সংখ্যা (২০১০) নেহাৎ কম নয়। জ্ঞান ও বিজ্ঞান, মানবমন, জ্ঞান বিচিত্রা, কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান, বিজ্ঞান মেলা, এবং কী কে ও কেন, এ যুগের কিশোর বিজ্ঞানী, জনবিজ্ঞানের ইস্তাহার, গণবিজ্ঞান চেতনা, বিজ্ঞান ভাবনা (মুর্শিদাবাদ), বিজ্ঞান অন্বেষক, অসুখ-বিসুখ, মনের কথা ইত্যাদি সাম্প্রতিক সময়ে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এ বছর বন্ধ হয়ে গেল একটি ভাল-নিয়মিত কাগজ—স্বাস্থ্য ও পরিবেশ। অন্বেষা, বিজ্ঞান মনীষী, সরকারি প্রয়াসে প্রকাশিত বিজ্ঞান জগৎ, গণিত জগৎ—অনেক দিন হোল বন্ধ হয়ে গেছে।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতার শিকড় আশ্রয় করে একবিংশ শতাব্দীর একটি দশকও আমরা অতিক্রম করেছি। আমার মনে হয়, সাম্প্রতিক সময়ের বিজ্ঞানের কাগজগুলির মূল্যায়নের নিরিখে, আমরা এগোচ্ছি না। মানে এখনকার এইসব প্রয়াস থেকে আমরা সমৃদ্ধ হচ্ছি না। একান্ত দায়সারা, অনুর্বর, গতানুগতিক প্রয়াস মাত্র এই সব প্রকাশনা প্রয়াস ঘিরে।

কেন এই কথা বলছি? সেটাই সর্বাগ্রে স্পষ্ট করা প্রয়োজন। স্টলে কতরকম পত্রিকা সাজানো থাকে। উপরোক্ত উল্লিখিত পত্রিকাগুলির দু'একটি কদাচিৎ কোনো পত্রিকা স্টলে পাওয়া যায়। ১০০/১৫০/২০০ টাকার লিট্‌ল ম্যাগাজিনের বিশেষ সাহিত্য সংখ্যা হৈ - রৈ করে বিক্রি হচ্ছে। বিজ্ঞানের পত্রিকার বিক্রি কোথায়? 'অপরাজিত' সাহিত্য পত্রিকার বিশেষ 'জগদীশচন্দ্র বসু সংখ্যা' প্রথমবার প্রকাশের পর নিঃশেষিত হওয়ার দ্বিতীয়বার ছাপতে হয়েছিল। এমন উদাহরণ কোনো বিজ্ঞান পত্রিকার ইতিহাসে কখনও ঘটেনি। অপরাজিত সাহিত্য পত্রিকা 'জল' নিয়ে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছিল, যা ৫০০ পৃষ্ঠার অধিক। অনুষ্টপ পত্রিকার 'জগদীশচন্দ্র বসু' সংখ্যাটি উল্লেখ করা যায়। 'বাঙালির বিজ্ঞানচর্চা' শিরোনামে বলাকা সাহিত্য পত্রিকার প্রয়াসও বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে।

১৯৮১ সালে আমি প্রথম সারা ভারত জনবিজ্ঞান সম্মেলনে উপস্থিত হই কেরালার ত্রিবান্দ্রমে - কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদের আমন্ত্রণে। সে সময় ওঁরা কেরলের ৪টি শহর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক সাংগঠনিক প্রয়াসে চারটি জনপ্রিয় (রঙিন) বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশ করতেন—যাদের প্রকাশ সংখ্যা সেই সময় ছিল নূন্যতম ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ অবধি। কয়েক বছর আগে একটি সর্বভারতীয় বিজ্ঞান সম্মেলনে ওড়িশার এক বিজ্ঞান সম্পাদকের সঙ্গে পরিচিত হই। ভুবনেশ্বর থেকে প্রকাশিত এই বিজ্ঞান পত্রিকার প্রচার ২৫ হাজার।

—দীপক কুমার দাঁ, ৯৪৭৪১৯২৭৯৯

বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রকল্প

1 পাতার পর

জানানো মেধা পাটেকরকে সমস্ত রির্পোট দেওয়া হয় যাতে রঘুবংশ প্রসাদ সিং (তৎকালীন কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রী)-এর হাতে বিষয়টি পৌঁছায়।

অবশেষে চাকদহে জলপ্রকল্প হচ্ছে, এক যুগের (১২ বছরের) আন্দোলন ও চাকদহের (দলমত নির্বিশেষে) মানুষের দাবী পূরণ হতে চলেছে। টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের, রাজ্য সরকারের পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্টের মধ্য দিয়ে খরচ হবে। জমি অধিগ্রহণ শুরু হয়ে গিয়েছে তাই প্রকল্পটি কি তা তুলে ধরা প্রয়োজন।

প্রকল্প ঃ—

Surface water Based Pipe water supply Scheme for Arsenic Affected Areas of Chakdaha Block Including Bulk Supply to Chakdaha Municipality of Nadia.

রেফারেন্স—Bid Notice No. 07/EC of 2008-09

প্রকল্প কারা করছেন কোন কোম্পানি—NAGARJUNA CONSTRUCTION CO. LTD. HYDERBAD

কত টাকার প্রকল্প বা প্রকল্প ব্যয়—112, 63, 19, 000/- (একশো বারো কোটি তেষট্টি লক্ষ উনিশ হাজার টাকা)।

কাজটি কারা দেখবেন—Executive Engineer, Nadia Arsenic Division-I, P.H.E.-Dept.

কতদিনের মধ্যে কাজ শেষ হবে— ১৫ মাসের মধ্যে।

যেখান থেকে জল তুলে সরবরাহ হবে—মুকুন্দনগর ঘাট (হুগলী নদীর/চূর্নীর মুখ) মৌজা-গৌরনগর (জে. এল. ১) চাকদহ ব্লক।

জল পরিশোধন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে—৩৪নং জাতীয় সড়কের পাশে পলাগাছা গ্রামে (জে. এল.-১৩) চাকদহ ব্লক।

সমগ্র পাইপ লাইনের মাপ— ৫১, ৬৯৫ কি.মি. (একান্ন হাজার ছয়শত পঁচানব্বই কি.মি. প্রায়)।

যেসব গ্রাম পঞ্চায়েতে এই বিশুদ্ধ জল পৌছবে—চাঁদুড়িয়া-১, মদনপুর-১, চাঁদুড়িয়া-২, রাউতারী,

দেউলী- শিলিন্দা-১, দুবড়া, শিলিন্দা-২, ঘেঁটুগাছি, শিমুরালী, হিংনাড়া, তাতলা-১, তাতলা-২

যে সব পৌরসভা জল পাবে—চাকদহ পৌরসভা (সমস্ত ওয়ার্ড)

যাঁরা এই জলপ্রকল্পে জমি দিচ্ছেন— মুকুন্দনগরে (হুগলী নদী ও চূর্ণীর মুখে) যেখান থেকে অপরিশোধিত জল তোলা হবে সেই জমিটি দিচ্ছেন মাননীয় শম্ভুনাথ বিশ্বাস, নিমাই বিশ্বাস, নিমাই বিশ্বাস (বিশ্বজিৎ), বরুন বিশ্বাস, স্বপ্না দাস প্রমুখ।

যেখানে জলপরিশোধিত হবে—(পলাগাছা) জমি দিচ্ছে পলাগাছা অঞ্চলের ৯৮ জন কৃষক ও বসবাসকারী কিছু সাধারণ মানুষ (১৩নং পলাগাছা মৌজা) চাকদহ ব্লক।

আমাদের আশঙ্কা— ১) চূর্ণী এবং হুগলী নদীর যে মুখ যেখানে থেকে অপরিশোধিত জল তোলা হবে সেখানে গরমকালে প্রয়োজনীয় জল থাকবে কিনা তা ভালো করে পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন।

২) পাঁচ বছর পর্যন্ত কোম্পানির দেখভালের দায়িত্ব আছে কিন্তু এরপর যাতে এই প্রকল্প সরকারের হাতেই যেন থাকে তা চাকদহের মানুষকে লক্ষ্য রাখতে হবে। P.P.P. (পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ) মডেলে বহুজাতিক কোম্পানির হাতে যেন এই প্রকল্প চলে না যায়।

৩) প্রকল্পের টাকা যেন কতিপয় ব্যক্তির পকেটস্থ না হয় তা লক্ষ্য রাখবার দায়িত্ব আপামর চাকদহবাসীর।

বিশুদ্ধ পানীয় জল মানুষের নাগরিক অধিকার এবং মৌলিক অধিকার। এই প্রকল্প সুস্থ ও সুন্দর হোক।

চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার পক্ষে অভিজিৎ অধিকারী (সম্পাদক) কর্তৃক প্রকাশিত, যোগাযোগ ঃ গ্রাম-কাঁঠালপুলি, পোঃ- চাকদহ, জেলা-নদীয়া, তাং-০১/০৫/২০১০

মোবাইল ঃ ৯৪৩৪১১০৯৬৯, ৯৭৪৯৪৮৬৬৪৯, ৯৭৩৫৭২২৭৪৩

চিঠি

মহাশয়,

বিজ্ঞান অন্বেষক সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১০ সংখ্যা পেয়েছি। সংখ্যাটি তথ্য মূলক রচনায় সমৃদ্ধ। বিশ্ব উষ্ণায়ন রচনাটি সমাজ মনস্ক মানুষকে ভাবাবে। ভারতীয় উপমহাদেশের পাখি লেখাটি সরস ও উপভোগ্য। । জলাভূমি বাঁচাতে কর্মসূচী সময় উপযোগী প্রয়াস। বিশ্ব পরিবেশ দিবস সাড়ম্বরে পালিত হয়। সারা বছর তার রেশ থাকে কতটুকু? শিল্প ভাবনায় প্রফুল্লচন্দ্র রচনাটি আকর্ষক। তপন চন্দের অক্টোপাশের ভবিষ্যদ্বাণী ভালো লেগেছে।

কোন এক সংখ্যায় রেইকি নিয়ে বিশদ আলোচনা করলে ভাল লাগবে। বর্তমান সময়ে টিভি চ্যানেলে জ্যোতিষ বাবাজীর মত রেইকির প্রার্দুভাব ঘটেছে।

পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। হৈমন্তিক শুভেচ্ছা সহ।

—সিদ্ধেশ্বর পোদ্দার, ১০৩, কাটাগঞ্জ, গোকুলপুর, নদিয়া

খবর

কলকাতা পুস্তকমেলায় ২০১১ অংশগ্রহণ

২৫ জানুয়ারী থেকে ৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১১, ৩৫ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তকমেলায় লিটল ম্যাগাজিন টেবিলে (১৯০ নং) বিজ্ঞান অন্বেষকের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করা হয়। গণবিজ্ঞান ভাবনারা পত্র-পত্রিকা, পুস্তিকাসহ টেবিলে কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার, কলিকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, বারাকপুর আর্কটিক সংস্থা, চেতলা গণ বিজ্ঞান কেন্দ্র, চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা সহ বিভিন্ন সংস্থা বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকা, উৎস মানুষ সহ বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও পুস্তিকাগুলি বেশ আগ্রহের সঙ্গে মানুষ দেখেন।

অরণ্য সম্পদ....

3 পাতার পর

হিমালয়ের পাহাড়ের কোলে ৮,০০০ ফুট উচ্চতায় 'টাইগার হিল' পর্যন্ত এই অরণ্যের বিস্তৃতি। এই অভয়ারণ্যের ২০০০-২৪০০ মিটার উচ্চতার মধ্যে ঘন ওক্ গাছ, কাপাসী, কাটুস, কাতলা, চাঁপা, বাঁশ ও বিভিন্ন প্রকারের ফার্ন এবং ফার্ন প্রভৃতি পাওয়া যায়। ২৪০০ মিটারের অধিক উচ্চতায় পিপালিং, উটিশ, ধুপি, চাপ এবং সর্বপরি রডোডেনড্রন জাতীয় বৃক্ষ দেখা যায়। রডোডেনড্রনের ফুলে পাহাড়ী অঞ্চল সৌন্দর্য্যের প্রতীক হয়ে থাকে। এখানে সীমিত স্থানে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা যথেষ্ট। এখানে কাকর হরিণ, বুনোশুয়োর, গোরাল, মেরু, পাহাড়ী কালো ভালুক, চিতা বাঘ, বনবিড়াল, চিতাবিড়াল, অসমীয়া বানর, শেয়াল প্রভৃতি বন্যপ্রাণী দেখা যায়। পাখিদের মধ্যে কালো কাঠঠোক্রা, চোরপাখি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অভয়ারণ্যটি দার্জিলিং বনবিভাগের

চিলা পাতার জঙ্গল ছবি : অরূপ গুহ

অধীনে। এই অরণ্য সংরক্ষিত বনহিসেবে চিহ্নিত ছিল ১৯৪১ সাল পর্যন্ত। ১৯৭৬ সালে মোট প্রায় ১১৬ বর্গ কি.মি. জায়গা জুড়ে এই অরণ্যকে অভয়ারণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বর্তমানে এর আয়তন ২১৬.৫ বর্গ কি.মি.। এই বনাঞ্চলের গঠন অনেকটা ইংরেজি অক্ষর 'V' আকৃতির। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত এই অভয়ারণ্যের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দুটি বড় নদী যথা—'তোর্ষা' ও 'মালঙ্গী' আছে। তোর্ষায় অবশ্য বর্ষাকাল ছাড়া তেমন জল থাকে না বললেই চলে। সেই অর্থে এখানকার প্রধান নদী মালঙ্গী। অরণ্য অঞ্চলই শুকনো ঝোড়া বা ঝর্ণা ও পরিত্যক্ত ছোট বড় নদীর সমষ্টি। এখানে শুষ্কমিশ্র; আদ্রমিশ্র ও শালবনের উপস্থিতি এই অভয়ারণ্যকে সমৃদ্ধ করে রেখেছে। নদীর মাঝের চরে ঘন ঘাসের বন আছে। এখানে মূলতঃ শিশু, খয়ের শিরিষ, ছাতিম, পিটানি, জাম প্রভৃতি বৃক্ষ জাতীয় গাছপালা দেখতে পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের শতকরা ৩০ ভাগই ঘাসবন, অনেক সময় এই ঘাসগুলোর উচ্চতা ১৫ ফুট পর্যন্ত হয়।

এক শৃঙ্গ গন্ডারের জন্য বিশেষ খ্যাত এই অভয়ারণ্যটি। এছাড়া অন্যান্য বন্যপ্রাণী সম্পদেও ভরপুর এই অভয়ারণ্য। এখানে একশৃঙ্গ গন্ডার ছাড়া বাঘ, ভারতীয় বাইসন বা গাউর, চিতা বাঘ, সাম্বার, হাতি, বারকিং হরিণ, কাকর হরিণ, চিতল হরিণ, শ্লথ্ ভালুক ও বিলুপ্ত প্রায় পাখি বেঙ্গল ফ্লোরিকেন প্রভৃতি পাওয়া যায়।

সরীসৃপ হিসেবে ময়াল বা অজগর, কেউটে বা গো-সাপ প্রভৃতি দেখা যায়। পাখির জগতেও খুবই আদর্শ এই অভয়ারণ্যটি। এখানকার ছোট ছোট নদী যেমন—হলং, চিরা খাওয়া, কালিঝোরা, সিসামারা ভালুকা এবং বুড়ি তোর্ষা প্রভৃতি দেখা যায়। এখানে ১২টি স্থানে কৃত্রিম ভাবে তৈরি করা নুনমাটির ব্যবস্থা আছে। এই নুনমাটির মাঠগুলি বন্য প্রাণীদের কাছে খুবই প্রিয়। এসব জায়গা থেকে গাছে বা উঁচু ভাবে তৈরি মিনার থেকে এই মাটি খেতে আসা বন্য প্রাণীদের সহজে দেখা মেলে।

অভয়ারণ্যটি বিভাগীয় বনাধিকারিক কোচবিহার এর নিয়ন্ত্রণাধীন। যদিও অঞ্চলটি জলপাইগুড়ি জেলায়। বাসে বা ট্রেনে সহজেই অভয়ারণ্যের নিকটবর্তী মাদারীহাটে (দূরত্ব মাত্র ৬ কি.মি.) পৌঁছানো যায় শিলিগুড়ি বা জলপাইগুড়ি থেকে। মাদারিহাটে মিটার গেজের একটি রেলস্টেশন আছে। শিলিগুড়ি থেকে সড়ক পথে ৩১নং জাতীয় সড়কের পাশেই অবস্থিত (শিলিগুড়ি থেকে দূরত্ব ১৫০ কি.মি.)। ব্রডগেজ রেলস্টেশন ফালাকাটা যা অভয়ারণ্যের দক্ষিণ দিকে ১৬ কি.মি. দূরে অবস্থিত। নিকটবর্তী বিমানবন্দর বাগডোগরা। পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দপ্তরের ৩টি টুরিষ্ট লজ অভয়ারণ্যের নিকটবর্তী মাদারীহাট, হলং ও বরদাব্রিতে আছে। এছাড়া মাদারীহাট, নীলপাড়া ও কেদালবস্তীতে বনবিভাগের ৩টি বাংলো রয়েছে। ভ্রমণের আর্দশ সময় এপ্রিল-নভেম্বর।

চাপড়ামারি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

১৯৪০-৪১ সাল নাগাদ এই অরণ্যকে সংরক্ষিত বন এর মর্যাদা দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে ১৯৭৬ সালে 'অভয়ারণ্য' হিসেবে পরিচিত হয়। বর্তমানে এর আয়তন মাত্র ৯.৬০ বর্গ কি.মি.। মুর্তী নদীর ধারে এই অভয়ারণ্যটি অবস্থিত।

এই অভয়ারণ্যটি মুলতঃ শুষ্ক মিশ্রজাতীয় বন। কখনও কখনও ক্ষুদ্র অমিশ্র ও পরিণত শালের বনের দেখা মেলে। এখানে লালি,চিলৌনি, কাঞ্চন, বহেড়া, পারারী, কাওলা প্রভৃতি বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ দেখা যায়। পাখির জন্য খুবই উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে এই অভয়ারণ্যটি। ৩১নং জাতীয় সড়ক অভয়ারণ্যটির পাশ দিয়ে চলে গেছে। এছাড়া নিকটবর্তী রেলস্টেশন হল চাপড়ামারি (মাত্র ২ কি.মি. দূরত্বে)। জলপাইগুড়ি বন্যপ্রাণ বিভাগ-২ এর নিয়ন্ত্রণাধীন বনবাংলো বনের ভেতরেই আছে।

— রাজা রাউত, জলপাইগুড়ি, সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব
মোবাইল ঃ ৯৪৭৪৪১৭১৭৮

তথ্যসূত্র ঃ

১) The book of Indian Animals-S.H.Prater.
২) ভারতের বন্যপ্রাণী ও অভয়ারণ্য—বিশ্বজিৎ রায় চৌধুরী

স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে সাপ সচেতনতা

ভারতে গড়ে প্রতি বছর সাপের কামড়ে প্রায় ২৫ হাজার মানুষ মারা যান। এক্ষেত্রে বেশির ভাগ মৃত্যুই হয় ভুল চিকিৎসা, কুসংস্কার বা সাপ সর্ম্পকে সঠিক ধ্যান ধারণা না থাকার জন্য।

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে সবচেয়ে বেশি বিষধর সাপ, অথচ মৃত্যুর হার অতি নগন্য।

সাপ দু'রকম : নির্বিষ ও বিষধর। বিষধর দু'রকম—ফনাধর (যথা: কেউটে, গোখরো ও শঙ্খচূড়) এদের মারণ পরিমাণ (যে পরিমাণ বিষ মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে মানুষ মারা যায়) যথাক্রমে ১৫ মিগ্রা, ১৫ মিগ্রা ও ১২ মিগ্রা। ফনাহীন বিষধর সাপগুলি যথা কালাচ (মারণবিষ: ১ মিগ্রা), শাখামুটি : ১০ মিগ্রা (ভারতে এই সাপে কামড়ের নজির এখনো পাওয়া যায়নি, শুধুমাত্র শাখামুটি সাপ ইন্দোনেশিয়াতে কামড়ায়), চন্দ্রবোড়া-৪২ মিগ্রা, গেছোবোড়া বা পাহাড়িচিতি-১০০ মিগ্রা, ফুরসা-৫ মিগ্রা।

সাপে কামড়ালে কিভাবে চিনবেন, কি করবেন, কি করবেন না, এসব এক গুচ্ছ বিষয় নিয়ে, নানা ধরণের সাপের ছবি, পোস্টার ও সাপের কামড়ের চিহ্ন নিয়ে ধারাবাহিক প্রচারের জন্য নিরলস প্রয়াস চালাচ্ছেন কোচবিহার—বিজ্ঞান চেতনা ফোরামের কর্মীরা। বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আলোচনা, প্রদর্শনীর আয়োজন করা হচ্ছে।

১৪ সেপ্টেম্বর, চকচকা হাইস্কুলে (কোচবিহার) সাপ নিয়ে সচেতনতা প্রসার ও প্রদর্শনীতে স্কুলের শিক্ষক সুবল দত্ত বলেন সাপ নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার এতো বেশি যে সাপ দেখলেই মেরে ফেলা হয়। আজকের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যদি সাপ নিয়ে সঠিক ধারণা দেওয়া যায় তবে সাপের কামড়ের মৃত্যুর হার কমানো যাবে। নির্বিষ ও বিষধর সাপের কামড়ের চিহ্নের পার্থক্য ছবির সাহায্যে বিজ্ঞানকর্মী জয়দেব দে ব্যাখ্যা করেন, বিষধর সাপের কামড়ের লক্ষণগুলি ব্যাখ্যা করে বলেন—

১। এক ইঞ্চি দুরত্বের মধ্যে কেবলমাত্র ২টি দাঁতের দাগ থাকবে।

২। কামড়ানোর জায়গাটিতে জ্বালা করবে, ফুলতে থাকবে। পরে নীলাভ হবে। রক্ত চুয়ে চুয়ে বের হতে থাকবে।

৩। চোখের পাতা পড়ে আসবে, ঘুম ঘুম ভাব, বমি ভাব যন্ত্রণা হবে শ্বাস নিতে কষ্ট হবে। এই লক্ষণগুলি কোবরা গ্রুপের সাপ কামড়ালে হবে।

৪। চন্দ্রবোড়া কামড়ালে পুড়ে যাওয়ার মতো যন্ত্রণা হবে। চোখ-নাক, মুখ প্রস্রাব পায়খানা থেকে রক্তপাত হবে। রক্তচাপ কমে যাবে।

৫। কালাচ (Common Krait) কামড়ালে পেটে খুব যন্ত্রণা হবে, শ্বাস নিতে কষ্ট হবে। প্রচন্ড জ্বালা হবে।

বিজ্ঞানকর্মী ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে জানান সাপ কামড়ালে প্রথমেই বুঝতে হবে বিষধর না নির্বিষ সাপের কামড়, বিষধর সাপে কামড়ালে খুব দ্রুত হাসপাতালে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে। একমাত্র চিকিৎসা হল অ্যান্টিভেনম্ সিরাম ইনজেকশন। রোগীকে হাঁটা চলা করানো ঠিক নয়, ক্ষত স্থানে কাঁটাছেরা করাও বিপজ্জনক, গরম জলে সেক করা চলবে না।

ধারাবাহিক ভাবে কোচবিহার টাউন হাইস্কুলের ছাত্রদের মধ্যে সাপ নিয়ে সচেতনতা অনুষ্ঠানে শিক্ষক অমল ধরজাস বলেন ছাত্রদের মধ্যে সাপের বিষয় নিয়ে সঠিক ধারণা থাকা খুবই প্রয়োজন। তিনি বলেন সাপের কামড়ে উত্তরবঙ্গে মৃত্যুর হার এখনো বেশ উল্লেখযোগ্য। হাসপাতালে অ্যান্টিভেনম সিরাম পর্যাপ্ত পরিমাণে রাখা দরকার। প্রায় ১০০ জন ছাত্রদের নিয়ে ১৫ সেপ্টেম্বর সাপ নিয়ে এক কর্মশালা ও প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন করা হয়। কোচবিহার বিজ্ঞানচেতনা ফোরাম, বিজ্ঞান অন্বেষক ও নীলকুঠি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন ফর হিউম্যান ডেভেলপম্যান্ট বা নোড (NWOHD) এর কর্মীরা ছাত্রদের সাপে কামড়ালে কি করতে হবে, কোন কোন সাপ বিষধর কোন কোন সাপ নির্বিষ ভালোভাবে ব্যাখ্যা করেন।

এক প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞান কর্মী জয়দেব দে বলেন আগে প্রত্যেক সাপের বিষের জন্য আলাদা আলাদা ওষুধ যেমন মোনোভ্যালেন্ট সিরাম ছিল, বর্তমানে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতিতে যেকোন বিষধর সাপে কামড়ালেই অ্যান্টিভেনম্ সিরাম (Poly Valent Anti Snake Serum) ইনজেকশন্ দিলেই কাজ হবে।

ছাত্রদের অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীজয়দেব দে জানান গোখরো, কেউটে বা শঙ্খচূড়— সাপের বিষ থেকে মানুষের অনেক জীবনদায়ী রোগের চিকিৎসার ওষুধ তৈরিতে কাজে লাগছে। আবার সাপ হল পরিবেশ বান্ধব কারণ দাঁড়াশ সাপ যদি না থাকে তবে ইঁদুরের উপদ্রবে প্রায় ২৫ ভাগ শস্যই নষ্ট হয়ে যাবে। সাপকে রক্ষণাবেক্ষণ করা খুবই জরুরী। প্রতি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বা হাসপাতালে অ্যান্টিভেনম্সিরাম ইনজেকশন সহ সাপের কামড়ের চিকিৎসা ব্যবস্থাটি থাকা খুবই জরুরী। তবেই সাপের কামড়ে মৃত্যুর হার কমানো যাবে।

কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরামের পক্ষ থেকে জানানো হয় আগামী অক্টোবর-নভেম্বর মাস জুড়ে জেলা জুড়ে সাপ ও পরিবেশ সচেতনতা নিয়ে স্কুলের পড়ুয়াদের মধ্যে ধারাবাহিক প্রচার চালানো হবে, সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতা প্রচারের উপযোগী পুস্তিকা, বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকা নিয়ে প্রচার অভিযান চালানো হবে।

সাপ নিয়ে কর্মশালা ও প্রশ্নোত্তর পর্বে সাপে কামড়ালে যা যা করতে হবে সেগুলি নিয়ে পোস্টার ছবি সাহায্যে বিজ্ঞানকর্মী জয়দেব দে ও প্রদীপ কৈরী ব্যাখ্যা সহ আলোচনা করেন ঃ—

এরপর ৪ পাতায়

প্রশ্নোত্তরপর্ব : বিষয় : জলাতঙ্ক রোগ

৪র্থ বর্ষ বিজ্ঞানী গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসার কর্মসূচীতে কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম আয়োজিত ৪/১২/২০১০ কোচবিহার মেলায় ২০টি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। ছাত্র-ছাত্রীদের সেরা প্রশ্নোত্তরগুলি ছাপানো হলো। — সম্পাদক

ভারতে প্রতি বছর প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষকে কুকুরে কামড়ায়। এদের মধ্যে কত মানুষ সময়মত জলাতঙ্কের প্রতিষেধক (অ্যান্টি র‍্যাবিস ভ্যাকসিন) পেয়ে থাকে, কত মানুষ শুধু ওঝার দ্বারা 'থালাপড়া' নেয় এবং কত মানুষ জলাতঙ্ক রোগে মারা যায় তার কোন প্রকৃত হিসেব আমাদের জানা নেই। তবে এটা পরিষ্কার বলা যায় যে প্রতিবছরই বহু মানুষ (প্রায় ৩০ হাজার) জলাতঙ্কে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। লুই পাস্তরের আবিষ্কারের আগে যারা জলাতঙ্কে মারা যেত তাদের জন্য কিছুই করার ছিল না। কিন্তু এখন সময়মত প্রতিষেধক নিতে পারলে জলাতঙ্কে রোগের কোন সম্ভাবনা থাকে না। এমনকি এই প্রতিষেধক দিয়ে কুকুরকেও নির্বিষকরণ করা যায় অর্থাৎ ঐ কুকুরে কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগ হবে না।

প্রশ্ন ঃ ক) জলাতঙ্ক রোগের জীবাণুর নাম কি এবং এটা কোন প্রাণীর লালাতে থাকে?

উঃ জলাতঙ্ক রোগের জীবাণুর নাম র‍্যাবিস বা র‍্যাবডো ভাইরাস। এটা কুকুর, বিড়াল, বাদুর ইত্যাদি প্রাণীর লালাতে থাকে।— জ্যোর্তিময়ী দাস, মহারানী ইন্দিরাদেবী বালিকা বিদ্যালয়, পারমিতা দত্ত—কোচবিহার উচ্চবালিকা বিদ্যালয়।

খ) জলাতঙ্ক প্রতিষেধকের নাম কি এবং কে আবিষ্কার করেন?

উঃ জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধকের নাম অ্যান্টি র‍্যাবিস ভ্যাকসিন্। ইহা ফরাসী বিজ্ঞানী লুইস পাস্তুর আবিষ্কার করেন।—অন্বেষা চক্রবর্তী, শ্রীরামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয়। রাখী রায়, মহারানী ইন্দিরা দেবী বালিকা বিদ্যালয়। অমিত দাস, শ্রীশ্রী করুনাময়ী উচ্চ বিদ্যালয়।

গ) কুকুরে কামড়ানোর পর যে সব মানুষকে থালাপড়া, ন্যাবার মালা দেওয়া হয় তাদের মধ্যে কারা ভাল হয় এবং কারা মারা যায়?

উঃ কুকুরে কামড়ানোর পর যেসব মানুষকে থালাপড়া, ন্যাবারমালা দেওয়া হয় তাদের মধ্যে যারা হাসপাতালে বা ডাক্তারের কাছে গিয়ে জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক অর্থাৎ অ্যান্টির‍্যাবিস ভ্যাকসিন গ্রহণ করে থাকে তারা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। আর যারা থালাপাড়া ন্যাবার মালা এসবের উপর ভরসা করে থাকে তারা জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।— জ্যোর্তিময়ী দাস, মহারানী ইন্দিরাদেবী বালিকা বিদ্যালয়। ঘ) তোমাদের মতে জলাতঙ্ক প্রতিরোধের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

উঃ ১) কুকুরের কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে। কুকুরে কামড়ানোর পর জলাতঙ্ক রোগ যাতে না হয় তার জন্য হাসপাতালে গিয়ে অ্যান্টির‍্যাবিস ইনজেকশন নিতে হবে। ২) প্রতিটি কুকুরকে নির্বিষ ও নির্বীজকরণ করা উচিত। ৩। যারা কুকুর পোষেন তারা তাদের কুকুরকে নিয়মিত নির্বিষকরণ (প্রতিষেধক) করতে হবে।—মনোজ হোসেন, সদর গভঃ হাইস্কুল, মৌমি দাস, মহারানী ইন্দিরা দেবী বালিকা বিদ্যালয়।

সাপ সচেতনতা

7 পাতার পর

১। রোগীর কাছে ভীড় করতে দেওয়া যাবে না। এতে রোগী ভয় পেতে পারে।

২। রোগীর মনোবল বাড়াতে হবে। রোগীকে আশ্বস্ত করতে হবে।

৩। 'সাপে কামড়ালেই মানুষ মারা যায় না'— একথা বোঝানো দরকার।

৪। হাঁটা চলা না করিয়ে রোগীকে স্থির ভাবে শোয়াতে হবে।

৫। নির্বিষ না বিষধরা ভালোভাবে বুঝতে হবে।

৬। বিষধর সাপের কামড় হলে ঠান্ডা জল দিয়ে পরিষ্কার করে মুছে, ক্ষতস্থান থেকে ৬/৮ ইঞ্চি দূরে পরপর দুটো হালকা বাঁধন দিতে হবে, হাল্কাভাবে বাঁধন দিতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বা হাসপাতালে নিয়ে যেতেই হবে সেখানে অ্যান্টিভেনম্ সিরাম সহ সাপের কামড়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে।

বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞান কর্মীরা জানান গাছ-গাছড়া বা মন্ত্র-তন্ত্র দিয়ে ওঝারা সাপে কামড়-এর রোগীকে ভালো করতে পাবেন বলে দাবী করেন। ওঝারা তখনই সাপে কাটা রোগীকে ভালো করতে পারেন যখন নির্বিষ বা ক্ষীন বিষ সাপে কামড়ায়, বিষধর সাপ যদি বিপজ্জনক মাত্রায় বা মারণ মাত্রায় বিষ ঢালতে পারে তবে ওঝা গুনিনরা ভালো করতে পারবেন না। সাপে কামড়ালে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত।

—নিজস্ব প্রতিনিধি

যোগাযোগ—বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর), পোঃ কাঁচরাপাড়া ৭৪৩১৪৫, উঃ ২৪ পঃ। ফোন ঃ ০৩৩-২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩৩০০৯২

সম্পাদক মন্ডলী—অভিজিৎ অধিকারী, বিবর্তন ভট্টাচার্য, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, তাপস মজুমদার, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, কিঞ্জল বিশ্বাস।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।

অক্ষর বিন্যাস ঃ রিম্পা কম্পিউ, কাঁচরাপাড়া হাইস্কুল মোড়, কাঁচরাপাড়া, চলভাষ ঃ ৯৮৩৬২৭১২৫৩

সম্পাদক—শিবপ্রসাদ সরদার। ফোন ঃ ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০)

E.mail-ganabijjnan@yahoo.co.in